পুঁই মাচা : সমাজ চিত্রণের গল্প

সংসার, যাপিত জীবন, সমাজের রীতিনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন সহায়হরির সাথে বাস্তববাদী, নীতিনৈতিকতায় বলিষ্ট, কঠোর অথচ মমতাময়ী একজন নারীর চরিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় পুঁই মাচা গল্পে যে সমাজের কথা বলেছেন সে সমাজে বিষফোড়ার মতো স্থান করে নিয়েছে বাল্যবিবাহ আর যৌতুক প্রথা। গল্পে তিনি জীবনের জটিল মনস্তত্ত্বের কোন ব্যাখ্যা দাড় করাননি বরং দিনহীন একটি পরিবারের স্বাভাবিক করুন কাহিনী সহজ সরল ভাষায় বর্ণনার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের একটি চিত্র এঁকেছেন।

স্ত্রী এবং তিন মেয়েকে নিয়ে সহায়হরির অভাব অনটনের সংসার। বড় মেয়ের বয়স তেরতে পড়েছে। এ বয়সেও বিয়ে না হওয়ায় তার স্ত্রীর দুঃশ্চিন্তার শেষ নেই। মেয়ের বিয়ে না হওয়ায় তাকে যে একঘরে করার কথা হচ্ছে সে উদ্বেগের কথা সে তার স্বামীকে জানায় কিন্তু সহায়হরির সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। সংসারের প্রতি তার এই উদাসিনতার রাগ গিয়ে পড়ে মেয়েদের উপর।

এক বিকেলে বড় মেয়ে কিছু পুঁই শাক আর চিংড়ি মাছ চেয়ে চিনতে নিয়ে আসে। বড় মেয়ের ক্ষেন্তির পছন্দ কুচো চিংড়ি দিয়ে পুঁইশাক। কিন্তু মায়ের রাগে তোড়ে তা ফেলে দিয়ে আসতে হয়। পরে বাড়িতে যখন কেই থাকে না তখন তার মা ফেলে দেয়া পুঁইশাক কুড়িয়ে নিয়ে এসে রাঁধে। দুপুরে খেতে বসে পুইশাক পাতে দেখে ক্ষেন্তির চোখ ছলছল করে ওঠে। পুঁইশাক ক্ষেন্তির এতো পছন্দের ছিলো যে ঘরের কোনায় সে লাগিয়ে রাখে পুঁইশাক। মাচা ভর্তি সে পুঁইশাক লকলক করে বাড়তে থাকে।

বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় ঘটকালিতে ক্ষেত্তির বিবাহ হয়ে যায়। দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করলেও পাত্রটির বয়স চল্লিশের খুব বেশি কোনোমতেই হবে না । দীনহীন সহায়হরি যৌতুকের টাকা ধীরে ধীরে শোধ করছিলো। কিন্তু টাকা না পেয়ে ক্ষেন্তির উপর অত্যাচার বাড়তে থাকে। এরমাঝে মেয়ের বসন্ত হলে গা থেকে সোনা গয়না খুলে তাকে ফেলে রেখে যায় পাশেই অপরিচিত এক আত্নীয়ের বাড়ীতে। সে বাড়ীতেই মৃত্যু হয় ক্ষেন্তির।

এই হলো পুঁইমাচা গল্পের কাহিনী। আহামরি কোন গল্প নয়, তবে বিভুতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় ভাষায়, পরিবেশ ও পরিস্থিতির চিত্রণে এমন মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন যে সাধারণ একটি কাহিনী অসাধারণ হয়ে উঠেছে -

> "স্ত্রী অন্নপূর্ণ খড়ের রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া শীতকালের সকালবেলা নারিকেল তেলের বোতলে ঝাটার কাটি পুরিয়া দুই আঙুলের সাহায্যে কাটার কাটিলগ্ন জমানো তৈলটুকু সংগ্রহ করিয়া চুলে মাখাইতেছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন মাত্র. . ."

-এটি গ্রাম বাংলার শীতের সকালের চিরপরিচিত চিত্র, তা মনে হয় কাউকে এর চেয়ে বেশি করে বর্ণনা দিয়ে বোঝানোর প্রয়োজন পড়ে না। শুধু দুলাইনের একটি বর্ণনায় কেমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে এ সকালটি।

বিভুতিভুষণ বন্দোপাধ্যায় যে সময়ে গল্পটি লিখেছিলেন সে সময়ে বাল্যবিবাহ এবং যৌতুকপ্রথা ছিলো সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সঙ্গতকারণেই এটি গল্পের মুল বিষয়, তবে মুল বিষয়টি বলতে গিয়ে বিভুতিভুষণ বন্দোপাধ্যায় বেশি সময় বা শব্দ ব্যবহার করেন নি। ক্ষেন্তির উপর শ্বশুর বাড়ীর নির্যাতন , যৌতুক ও তার মৃত্যুর বিষয়টি প্রতিবেশি বিষ্ণু সরকারের সাথে আলাপচারিতায় স্বল্পকথায় বর্ণনা করেছেন -

> "-আমার স্ত্রী অত্যন্ত কান্নাকাটি করাতে পৌষমাসে দেখতে গেলাম। মেয়েটার যে-অবস্থা করেছে। শাশুড়িটা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, না-জেনেশুনে ছোটলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করলেই এরকম হয়, যেমনি মেয়ে তেমনি বাপ, পোষ মাসের দিন মেয়ে দেখতে এলেন শুধু-হাতে!
>
> -মেয়ে তো কিছুতে পাঠাতে চায় না। আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকি ছিল, বললে ও টাকা আগে দাও তবে মেয়ে নিয়ে যাও।
>
> —তারপর বললাম, টাকাটা ভায়া ক্রমে-ক্রমে দিচ্ছি। "

আর প্রিয় মেয়েটির মৃত্যু ঘটনা এমনভাবে তুলে ধরেছেন অমনযোগী পাঠকের তা দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে-

" –তারপর ফাগুন মাসেই তার বসন্ত হল। এমন চামার-বসন্ত গায়ে বেরুতেই টালায় আমার এক দূর-সম্পর্কের বোন আছে, একবার কালীঘাটে পুজো দিতে এসে তার খোঁজ পেয়েছিল—তারই ওখানে ফেরে রেখে গেল। আমায় না একটা সংবাদ, না কিছু। তারা আমায় সংবাদ দেয়। তা আমি গিয়ে..."

গল্পের সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র ক্ষেন্তির মা অন্নপূর্ণ। নীতি নৈতিকতা, কঠোরতা, কোমলতা, মমতাময়ী মা এসবের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে এ চরিত্রে। মুলত এ চরিত্রটির কারনেই গল্পটি অসাধারণ হয়ে উঠেছে -

"স্ত্রীর অতিরিক্ত রকমের শান্ত সুরে সহায়হরির মনে ভীতির সঞ্চার হইল। ইহা -যে ঝড়ের অব্যবহতি পূর্বের আকাশের স্থিরভাব মাত্র, তাহা বুঝিয়া তিনি মরিয়া হইয়া ঝড়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। "

মুখুয্যে বাড়ী যাওয়ার পথে জঙ্গলের ভিতর থেকে পনের ষোল সের ওজনের একটি মেটে আলু চুরি করে তুলে ঘাড়ে করে নিয়ে এসে সহায়হরি যখন উঠোনে ফেললো তখন তার স্ত্রীর প্রশ্নের কোন জবাই সে দিতে পারলো না। তার স্ত্রী তখন বললেন—

"-চুরি তো করবেই, তিন কাল গিয়েছে এক কাল আছে, মিথ্যা কথাগুলো আর এখন ৰোলো না ...আমি সব জানি।

-তোমার তো ইহকালও নেই, পরকালও নেই, চুরি করতে ডাকাতি করতে, যা ইচ্ছে করো, কিন্তু মেয়েটাকে আবার এর মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর মাথায় খাওয়া কিসের জন্যে? "

মেয়ের বিয়ে নিয়ে সহায়হরির স্ত্রী যখন তার স্বামীর সাথে বাকবিতন্ডা করছিলেন তখন ক্ষেন্তি ও তার দুইবোন মাথায় করে একগোছা পাকা পুঁইশাক মাথায় করে ঘরে ঢুকলো। সহায়হরি আনন্দিত হলেও অন্নপূর্ণা দাওয়া হইতেই অত্যন্ত ঝাঁজের সহিত চিৎকার করিয়া উঠিলেন-

"-নিয়ে যা, আহা কী অমর্তই তোমাকে তারা দিয়েছে...পাকা পুঁইডাটা কাঠ হয়ে গিয়েছে, দু-দিন পরে ফেলে দিত...নিয়ে যা... আর উনি তাদের আগাছা উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন-ভালোই হয়েছে, তাদের আর নিজেদের কষ্ট করে কাটতে হল না.

-ক্ষেন্তির চোখ ছলছল করে উঠলো। ছোট মেয়েটি তা নিয়ে ফেলে দিয়ে আসলো। দুপুরে রাঁধতে গিয়ে ক্ষেন্তির পুঁইশাক পছন্দের কথা তার মনে হলো। বাড়িতে কেহ ছিল না, তিনি নিজে গিয়া উঠানের ও খিড়কি-দোরের আশেপাশে যে ডাটা পড়িয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আসিলেন— বাকিগুলো কুড়ানো যায় না, ডোবার ধারের ছাই-গাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। কুঁচো চিংড়ি দিয়া এইরূপে চুপিচুপিই পুইশাকের তরকারি রাঁধিলেন। দুপুরবেলা ক্ষেত্তি পাতে পুঁইশাকের চচ্চড়ি দেখিয়া বিষ্ময় ও আনন্দপূর্ণ ডাগর চোখে মায়ের দিকে ভয়ে-ভয়ে চাহিল। "

গল্পের সবচেয়ে করুন আর হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা আছে শেষের দুটি প্যারায়। গল্পটির ভিন্নরকম আমেজ এবং পুঁই মাচা গল্পটির নামকরণের বিষয়টি পাঠক এখানে এসেই বুঝতে পারে -

" তারপর সে-রাত্রে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। পিঠে গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে...রাতও তখন খুব বেশি।...জোছনার আলোয় বাড়ির ফিচনের বনে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাঠঠোকরা পাখি ঠক-র-র-ল্ শব্দ করিতেছিল, তাহার স্বরটাও যেন ক্রমে তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছে...দুই বোনের খাইবার জন্য কলার পাতা চিরিতে চিরিতে পুটি অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল-দিদি বড় ভালোবাসত...

তিনজনেই খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর তাহদের তিনজনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপনাআপনি উঠানের এককোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল.যেখানে বাড়ির সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের-হাত-পোতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া, কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাছা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে...সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর!.."

পুঁই মাচার এই লাবণ্যে ভরপুর কচি সবুজ ডগাগুলোর মাঝে তিনজনই যেন ক্ষেন্তির অবয়ব খুঁজে পায়। এমন ডাগর

ডাগর মেয়েটির অকাল প্রয়ানের কথা স্মরণ করে তিনজনই নিবাক বসে থাকে।

গল্পটির সবচেয়ে বড় সার্থকতা এর মেদহীন বর্ণনা। দিনহীন একটি পরিবারের স্বাভাবিক জীবনযাপন আর কথপোকথনের মাধ্যমে সে সময়ের চিত্র, সামাজিক সমস্যার প্রেক্ষিতে করুন একটি কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের সমাজ চিত্রনের এই দক্ষতা আর কারো মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না।

লেখক পরিচিতি

মোমিনুল আজম

গল্পকার। প্রবন্ধকার।

তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট